

হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐক্য

ও

কবি নজরুল ইসলাম

অমৃতলাল বালা

নির্মম হলেও একথা সত্য যে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মানস মুসলিম ঐতিহ্যকে আপন ভাবতে পারে নি, তেমনি মুসলমানরাও হিন্দু সংস্কৃতিকে অনীহার দৃষ্টিতে দেখেছে। এই ঈর্ষণ-বিদ্বেষ কণ্টকিত সমাজে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি একটা সুস্থতার হাওয়া বইয়ে দেন।^১ নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য-সাধনায় হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধন এক অমর কীর্তি।

নজরুল ইসলাম ছিলেন উদার-অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। কাব্য প্রতিভার মতো উদার মানবতাও ছিল তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি। হিন্দু-মুসলমানের প্রেম, সম্প্রীতি ও মৈত্রীর আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাঁর কবিতা, সঙ্গীত, গল্প, উপন্যাসে এই মনোভাব সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিলো। 'তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের স্থান সবার উপরে—ধর্ম শাস্ত্র, মসজিদ-মন্দিরের চেয়েও পবিত্র এই মানুষ। মানুষকে ভালোবাসেন — মানুষের সর্বাঙ্গিক মুক্তি চান বলেই কবি পরাধীন জাতির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন, শ্রমিক-কৃষক সর্বহারা মানুষকে দিতে চান অনুব্রতের অধিকার'। নজরুলের কাছে সব জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শ্রদ্ধা পেয়েছে। সকল ধর্মের উপর তিনি মানব ধর্মকে স্থান দিয়েছেন। মানবতাবাদী নজরুল ছিলেন সত্য ও সুন্দরের পূজারি।

একই কারণে নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রবক্তা। নজরুল কবি-মানসের তা আশ্চর্য ফসল। নজরুল-কবিসত্তার এ অভিব্যক্তির স্বরূপ উপলব্ধির জন্যে আমাদের একটু পেছনে ফিরে তাকাতে হবে। কারণ ভারতবর্ষে এ দু'টি জাতি-সম্প্রদায় যুগ-যুগ পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে। রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক- ধর্মীয় কারণে তারা যেমন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে, আবার পারস্পরিক সৌহার্দ-সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। এসবের বাস্তব চিত্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের চতুর্দশ শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ের সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গ, সম্পর্ক ও তার প্রভাব বেশ ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ তুর্কী শাসনাধীনে যাওয়ার পর এদেশীয় হিন্দু-বৌদ্ধ জনগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বহিরাগত

সাহিত্যিকী

ইসলামের সঙ্গে এদেশীয় ধর্মসংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে একটি সমন্বিত রূপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ধর্মাস্তরিত হলেও পূর্বজীবনের সংস্কার-বিশ্বাস তাদের রক্তে-মজ্জায় মিশে ছিলো। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু-ধর্মগত জাতিতে মুসলমান'।^২ হিন্দু—বৌদ্ধ লোকাচার সম্বলিত ও সমন্বিত বাংলার ইসলামকে 'লৌকিক ইসলাম' বলা হয়েছে।^৩ বহিরাগত সুফিমতের ইসলাম বাংলায় প্রচলিত ধর্ম-দর্শন-সংস্কারের সঙ্গে একটা আপোষ করে নিতে সক্ষম হয়।^৪ তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, বাংলায় তথা ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের কোনো বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে কি? তাঁরাচাদ অবশ্য মনে করেন, ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের কোন বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র সংস্কৃতি নেই, যা আছে ভারতীয় সংস্কৃতি; দীর্ঘকাল একত্রে বসবাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাচারে ও জীবনাচারের বহু ক্ষেত্রে প্রায় একাত্ম হয়ে গেছে।^৫ এ বক্তব্যের সঙ্গে একটু সংযোজন করে বলা যায় —'প্রকৃতপক্ষে মানুষের হৃদয়ানুভূতিতে ও মননে এমন একটি স্তর আছে দীর্ঘদিন পাশাপাশি কিংবা একত্রে বসবাসের ফলে সমস্ত ভেদাভেদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়।^৬ তা সত্ত্বেও এ বক্তব্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কেননা 'দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করা সত্ত্বেও উভয়ের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয় নি। হিন্দুর বাংলা সাহিত্যে যেমন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মুসলিম প্রভাব আছে, তেমনি মুসলিমবাংলা সাহিত্যেও পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ হিন্দু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে একথাও যথাযথ যে, দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে স্থানীয় আচার-আচারণ ও সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং তার প্রভাব সুদূর প্রসারী হয়েছে।'^৭

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সুলতানী আমলের সাহিত্য সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ

এই যুগে হিন্দুর বাংলা-সাহিত্যের যেমন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মুসলিম প্রভাব পড়িয়াছে, মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যেও তেমনি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ হিন্দু-প্রভাব পড়িয়াছে। ইহার অর্থ এই নহে যে, হিন্দুরা মুসলমান কিংবা মুসলমানেরা হিন্দু হইয়া যাওয়ার ফলে এমনটি হইয়াছিল। এই দেশে হিন্দু ও মুসলমান যুগ যুগ ধরিয়া পাশাপাশি বাস করার ফলেই যে এই প্রভাব পড়িয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুসলমানের সংস্কৃত চর্চা এবং হিন্দুর ফরাসী চর্চাও এই প্রভাবের অন্যতম কারণ।^৮

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের সাহিত্য অনুশীলন করলে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের এ-অভিমত সত্যের প্রতিধ্বনি বলে মনে হবে। প্রকৃতপক্ষে, ছ'সাত শ' বছর পাশাপাশি বাস করলেও বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য কখনো লুপ্ত হয়নি। এবং

হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐক্য ও কবি নজরুল ইসলাম

‘বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের কাল থেকেই হিন্দু-মুসলমান আপন আপন স্বাতন্ত্র্যকে সম্বলিত রক্ষা করেছে. পরস্পরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কিছু কিছু দাঙ্গা-হাঙ্গামা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান মোটামুটি অন্ধ-বিদ্বেষহীন শান্তিকামী প্রতিবেশী।’^৯

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ভারতীয় উপমহাদেশে একদিকে সাম্যবাদী চিন্তা তরুণ সমাজের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে। অন্যদিকে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মঞ্চে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দানা বেঁধে ওঠে। বাঙ্গালিপল্টন প্রত্যাগত হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তাজগত এই উভয় শক্তি, অর্থাৎ সাম্যবাদ ও খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন-কেন্দ্রিক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি, ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এই উভয় শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে, কবি সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তাঁর লেখনী চালনা করেন। বহুতর বাঙ্গালি সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম সাম্যবাদী চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্য রচনা করেন।^{১০} নজরুলের জীবনী থেকে জানা যায় যে, মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম ১৯২১ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সে সম্পর্কে পড়াশুনা শুরু করেন।^{১১} সমকালীন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পরিবেশে এই সাম্যবাদী চিন্তা একটা ধর্মনিরপেক্ষ মনবতাবাদের (হিউম্যানিজম) কল্পনায় কবিকে উদ্বুদ্ধ করে। তাই নজরুল ইসলামের কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের চিত্র তাঁর পূর্ববর্তী সকল কবিদের রচনা প্রণালী থেকে ভিন্নমুখী।^{১২} তার কারণ নজরুল ইসলামের সাহিত্যেই সর্বপ্রথম ‘সাম্যবাদ ও খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন-কেন্দ্রিক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি’ এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয় ব্যাপক ও গভীরভাবে প্রস্ফুটিত হয়। ‘সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সমন্বয়- সাধন, বাংলা সাহিত্যে নজরুলের এক অমর কীর্তি। তাঁরই কাব্যে প্রথমবারের মতো বাঙালি জাতীয়তা প্রকাশ পেল। তাঁর কবিতায়, গানে গল্পে ও উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গলা ধরাধরি করে’^{১৩} মিলিত হয়েছে। তাঁর কবিতার বিষয় হয়েছে কোরবানি, মহররম যেমন, তেমনি দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা। এই সংস্কৃতি ও পুরাণকে তিনি সমকালীন চেতনার দ্বারা নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন। কোরাণ ও পুরাণ তাঁর রচনায় একাকার। তাঁর চেতনায় ধর্মীয় গণ্ডির সীমাবদ্ধতা ছিলনা। আনন্দময়ীর আগমনে তিনি যে কবিতা রচনা করেন তাতে ধর্মের কিছু নেই — আছে আধুনিক সমাজচেতনা। ফলে তা ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়লো; আবার কোরবানি উপলক্ষে

সাহিত্যিকী

যে কবিতা তিনি রচনা করেন “তাতেও ফুটে উঠল স্বাধীনতার জন্য আত্মদানের আকৃতি, সংগ্রাম ত্যাগের আদর্শ। তাই নজরুল যা রচনা করলেন, তার বিষয় মুসলিম ঐতিহ্য বা পুরাণ যাই হোক, তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তিনি এই পথ বেছে নিয়েছিলেন’।^{১৪} যেহেতু তাঁর সামনে ছিলো ‘সাম্যবাদ ও খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন কেন্দ্রিক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি’র আদর্শ।

একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৃটিশ-ভারতে হিন্দু-মানস মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতিকে আপন ভাবতে পারেনি কোনোদিন, এবং মুসলিম সমাজও হিন্দু-সংস্কৃতিকেও অনীহার দৃষ্টিতে দেখেছে। হিন্দু-মুসলমানের এই বিভেদ, সাম্প্রদায়িক উত্তাপ-উত্তেজনা সৃষ্টিতে বৃটিশ অপশাসন ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থেকেছে।’ এই ঈর্ষণ-বিদ্বেষ-কটকিত সমাজে নজরুল একটা সুস্থতার হাওয়া বইয়ে দিলেন। আল্লাহ-ভগবান, মসজিদ-মন্দির-গির্জা, ঈসা-মুসা, কৃষ্ণ-বুদ্ধ-মোহাম্মদ প্রভৃতি ধর্মীয় ঐতিহ্যকে তিনি এই আধারে পরিবেশন করে বাঙালি পাঠকের মানসিক সংকীর্ণতা দূর করলেন। বিশেষত আরবি-ফারসি শব্দ সম্পর্কে হিন্দু মনে যে-অবজ্ঞা ছিলো নজরুলের সুকৌশল প্রয়োগের দরুণ তা বেশিদিন টিকলো না। এর ফলে হিন্দুরা পরিচিত হলেন মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে, মুসলিম পুরাণের সঙ্গে। আজাদ, আজাদি, শহীদ, মরদ, জিন্দা, শারাব, সাকি বেহেশত, দোজখ, ফেরেশতা প্রভৃতি আরবি-ফারসি শব্দ নজরুলের হাতে নতুন প্রাণ পেল; নতুন অর্থ নতুন ব্যঞ্জনা সজীব হয়ে”^{১৫} সর্বজনীন হয়ে উঠলো। কিন্তু নজরুল-পূর্ব কবিতায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের এমন মৈত্রী, সম্প্রীতি লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর পূর্বে কাহিনী-কাব্যে হিন্দু কবিদের মধ্যে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, নবীনচন্দ্র; খণ্ড-কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত, দীনেশচন্দ্র বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন। মুসলিম কবিদের মদ্যে কাহিনী কাব্যে ওসমান আলী, কায়কোবাদ, গোলাম হোসেন, খণ্ড কবিতায় মীর মশাররফ, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রভৃতির কবিতায় হিন্দু প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কবির কাব্য-কবিতায় সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো কাব্য-কবিতায় সুসংহতিগত সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় না। নজরুলের কবিতায় হিন্দুমুসলমান সম্পর্কিত বিষয়টি তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের থেকে ভিন্নতর। এর মূল কারণ হলো সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি। ‘নজরুল প্রথম জীবনেই রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি প্রথম থেকেই সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিরূপ ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে তিনি

হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐক্য ও কবি নজরুল ইসলাম

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অন্তর্ভুক্ত যে মজুর স্বরাজ পার্টি গড়া হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিলো মূলত সাম্য প্রতিষ্ঠা।^{১৬}

আর শ্রমিক-কৃষক দলের রাজনৈতিক আবরণের তলায় কমিউনিষ্ট দল গঠন করাই ছিলো মূল লক্ষ্য। এ পার্টির ‘লাঙল’ ছিলো নজরুল- পরিচালিত। বাংলা তথা ভারতে সত্যিকার অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা এখান থেকেই। নজরুল তাই ঘোষণা করেছিলেনঃ

হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?

কাগরী, বল ভুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা’র!

নজরুলের সাম্যবাদ ‘ভাবাবেগ- প্রসূত’ নয়, তা তাঁর সচেতন প্রয়াসের ফসল। এবং তা সমাজ-সচেতনতায় পূর্ণ। ‘নজরুল তাঁর জীবন ও সাহিত্য-কর্মে অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত’ করেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে বলেছেন,

হিন্দু-মুসলমান দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষণ-স্বপ্নের মত জমা হয়ে আছে, এই অসাম্য, এই ভেদভ্রম দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্ম-জীবনে অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম।^{১৭}

নজরুল তাঁর অভিভাষণে একথাও বলেছেন যে, ‘আমাকে কেবল মুসলমান বলে দেখবেন না; আমি যদি আসি, আসব হিন্দু-মুসলমানের সকল জাতির উর্ধ্বে যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ তাঁরই দাস হয়ে’। নজরুল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদের অস্তিত্ব মনে নি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো উদার, মানবতার আদর্শ রক্ষায় তিনি অবিচল ছিলেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে লিখেছেনঃ ‘আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরও হইয়া গেল। আল্লার ও মা কালীর ‘প্রৈষ্টিজ’ রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল, তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম—তখন তাহারা আল্লা মিঞা বা কালী ঠাকুরানীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া একভাষায় আর্তনাদ করিতেছে ‘বাবা গো’, মা গো’। মাতৃ-পরিত্যক্ত দু’টি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া একস্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে।’ এভাবে তিনি জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে মানব-ধর্মকে স্থান দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের যে ধর্ম ও ব্রত

সাহিত্যিকী

নজরুল ইসলাম তাতেই দীক্ষিত হন। তাঁর ধারণা ছিলো—সংকীর্ণ জাতীয়তা ও সম্প্রদায় প্রীতির দিন শেষ হয়েছে, মানবতার যুগ আসন্ন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দ্বি-জাতিতত্ত্ব তথা সম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর দেশ বিভক্ত হলে দেখা গেল নজরুলই বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষেত্র।^{১৭}

এটি লক্ষ্য করে সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় একটি ছড়ায় লিখেছিলেন :

‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল,
আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।’

নজরুল কবি-মানস বিভক্তির মধ্যে নয়, বরং অসাম্প্রদায়িক ও ঐক্যসাধনে তা পূর্ণাঙ্গভাবে প্রমূর্ত। তিনি হিন্দু-মুসলিম গণমানুষের কবি। সমাজ-বিপ্লবের এষণা তাঁর সাহিত্যসাধনার মূলে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। হিন্দু-মুসলিম সমাজের নির্বিকৃত, নিঃস্ব, নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা-ব্যর্থতা ও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্যে তাঁর বিদ্রোহ-বাণী উচ্চারিত। সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শাসনের রুদ্ধশ্বাস পরিবেশে নজরুল ‘রুদ্ধের দূত’। তিনি সারা জীবন অনমনীয়, দুর্বীর আপোষহীন থেকেছেন। জাতীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি তিনি নির্যাতিত শ্রেণীর মুক্তির কথা ভেবেছেন ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। তাঁর পূর্বসূরির যেখানে বলেছেন, ‘জাগো দেশ, জাগো জাতি’, নজরুল সেখানে বলেছেন, ‘জাগো নিপীড়িত, জাগো কৃষক, জাগো শ্রমিক, জাগো সর্বহারা মানুষ’। গণমানুষের কবি হিসেবে নজরুলের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা এখানে। এখানেই তিনি যুগোত্তীর্ণ। এই বিপ্লবাত্মক সমাজ-চেতনা বাংলা সাহিত্যে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান। ‘লাঙল’ ও ‘গণবাণী’র যুগে বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের জন্য সুগভীর বেদনাবোধ ও সহমর্মিতা উৎসারিত হয়েছে। মানবতা লাঞ্ছিত ও ভুলুষ্ঠিত হতে দেখে ব্যথিত চিত্তে কবি বলেছেনঃ

দেখিনু সেদিন রোলে,
কুলি বলে এক বাবুসা’র তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এলো জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?

সমাজ-জীবনের সর্বত্র কবি কামনা করেছেন মানবতা, সাম্য, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। সত্য, ন্যায় ও মুক্ত-স্বাধীন জীবনলাভের উদ্দীপনায় গণমানুষের কবি নজরুল যে সাম্যের গান গেয়েছেন, তা হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য মুক্তির সনদ রূপে বিবেচিত হতে পারে। কবি লিখেছেনঃ

হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐক্য ও কবি নজরুল ইসলাম

গাহি সাম্যের গান—

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান

যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীতান।

গাহি সাম্যের গান!

‘নবযুগ’ প্রবন্ধে এরই চরম সত্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কবি বলেছেনঃ ‘এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রীতান! আজ আমরা সব গভী কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না।’

নজরুলের রচনায় হিন্দু-মুসলিম উভয় ঐতিহ্য থেকে অবলীলাক্রমে বিষয়বস্তু, উপমা, রূপক, বাকভঙ্গি ও প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কালীকীর্তন রচয়িতা, তেমনি অন্যদিকে তিনি বাংলা ইসলামি গানের প্রবর্তক ও কাব্যে আমপারা, মরুভাস্কর প্রভৃতি প্রণেতা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কালী-কীর্তন ও না’ত রচনায় তিনি প্রায়-তুলনীয় চিত্রকল্প রচনা করেছেন। এজন্য ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেছেন, ‘মনে রাখা দরকার, সমগ্র আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামই একমাত্র কবি যিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ঐতিহ্যকে আপন কাব্যে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন।’^{২০} কবি মানুষের কোনো ‘জাত’ দেখেন নি; তিনি ‘সত্যের’ উপাসক। কবি তাই বলেছেনঃ

হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগন তলের সীমা হারা মুক্তির
মান্নে দাঁড়াইয়া—মানব!—তোমার কণ্ঠের সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি। বল দেখি,
‘আমার মানুষ ধর্ম’। দেখিবে, দশদিকে সার্বভৌমিক সাড়া আকুল স্পন্দন কাঁদিয়া উঠিতেছে।
মানবতার এই মহাযুগে একবার গভী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রহ্ম নও, তু
নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ— তুমি সত্য।^{২১}

নজরুলের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা, ‘খেয়াপারের তরলী’ ইসলামী বিশ্বাসজাত এবং ‘লা শরিক আল্লাহ’ - এ আরবি বাক্যটি অবলীলাক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতাটি তাঁর সাম্যবাদী চিন্তা ও ভাবাদর্শ অবলম্বনের পূর্বে রচিত।^{২২} তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। কবি লিখেছেনঃ

আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস

আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্নিশ।

সাহিত্যিকী

আমি বস্ত্র, আমি ঈশান বিষণ্ণে ওঙ্কার,
আমি ইব্রাহিমের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!

নজরুলের কবিতায় সচেতনভাবে হিন্দু-মুসলমান সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসরণের সফল প্রয়াস লক্ষণীয়। বিষয়বস্তু, রূপক, উপমা, অনুষঙ্গ, প্রসঙ্গ তিনি যেখান থেকেই গ্রহণ করুন না কেন, কবির লক্ষ্য ছিলো মানবতার উদ্বোধন ও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন। তিনি একদিকে তুরস্কের বীর কামাল আতাতুর্কের 'বৈপ্লবিক ইসলামের আদর্শ' অনুসরণ করে 'কামাল পাশা' কবিতা এবং 'কামাল' প্রবন্ধ রচনা করছেন; আবার একই সময়ে তিনি বিপ্লবী হিন্দু সংস্কৃতির আদর্শ অনুসরণ করে 'রক্তাশ্রুধারিণী মা' ও 'আগমনী' কবিতা রচনা করেন। এ ছাড়াও 'আগ্নিবীণা' কাব্যে আর যতগুলি কবিতা স্থান পেয়েছে সামগ্রিকভাবে বলা যায়—নজরুলের সাম্যবাদী আদর্শের প্রভাবজাত এ কবিতাগুলি এবং সেখানেও হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে। এ সাম্যবাদী-চেতনার ফলে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের বৈপরীত্যের দ্যোতক না হয়ে পরিপূরক হতে পেরেছে। তাঁর একটি বিখ্যাত কালীকীর্তন নিম্নরূপঃ

আমার কালো মেয়ের পায়ের নীচে
দেখে যা আলোর নাচন
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন॥
আমার কারো মেয়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগণ॥

নজরুলের একটি অতি পরিচিত না'ত এ সঙ্গে তুলনীয়ঃ

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূণিয়ারই সেখা চাঁদ দোলে॥
যেন উষার কোলে রাজা রবি দোলে।

নজরুলের ফণি-মনসা কাব্যের 'পথের দিশা' কবিতাটি ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সর্বনাশা দাঙ্গার সময় রচিত। এ কবিতায় কবি বলেছেনঃ

মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার
রে অশ্রুত, ভাসতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়!

হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐক্য ও কবি নজরুল ইসলাম

তাঁর 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' কবিতায় আশার বাণী শোনা যায়ঃ

যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ ধুঁড়া।
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ—জেগেছে তো তবু—বিষয় কেতন উড়া!
ল্যাজে যদি তোর লেগেছে আগুন, স্বর্ণ লঙ্কা পুড়া।

নজরুলের কেবল কবিতায় নয়, সঙ্গীত-গল্প-উপন্যাসেও হিন্দু-মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির সমন্বিত চিত্র ফুটে উঠেছে। 'কুহেলিকা'য় প্রমত্তর কণ্ঠে নজরুলেরই বাণী বাঙ্ময় হয়ে ওঠেঃ

আমার ভারতবর্ষ—ভারতের এই মুক-দরিদ্র- নিরন্ন- পরপদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইন্দিয়া হিন্দুস্থান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়, আমার ভারতবর্ষ যুগে যুগে পীড়িত মানবাস্থার ক্রন্দনতীর্থ। কত অশ্রু-সাগরে চড়া পড়ে গড়ে উঠল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ। ওরে, এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়, এ আমার মানুষের—মহা মানুষের মহাভারত। (কুহেলিকা)

কবি তাঁর একটি বিখ্যাত সঙ্গীতে সনাতন শাস্ত্রীয় আচারের সংকীর্ণ গণ্ডি লঙ্ঘন করে হিন্দু-মুসলমানদের বেরিয়ে আসার আহবান জানান। একই সঙ্গীতে তিনি সর্বহারাদের মুক্তির বাণীও গুনিয়েছেন :

আদি শৃংখল সনাতন শাস্ত্র আচার
মূল সর্বনাশের, এরে ডাঙ্গির এবার!
ডেদ দৈত্য কারা
আয় সর্বহারা!

সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনা নজরুল ইসলামকে হিন্দু-মুসলমান সমাজের মধ্যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের (হিউম্যানিজম) আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি তাঁর রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন উভয় সমাজের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির মধ্য থেকে। কারণ তিনি জানতেন উভয় সমাজের এই সাংস্কৃতিক প্রবাহ ও বৈচিত্র্যময় রূপবিন্যাসের দ্বারা তাঁর সাহিত্যকে জনতার কাছাকাছি করে তোলা সম্ভব। কবি-রুদয়ে অনুভূত এই তাগিদ থেকেই হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধন করে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়, 'তিনি বাংলার হিন্দু-মুসলিম-এই উভয় সম্প্রদায়ের মনোবিকাশের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। আর এ কারণেই তাঁকে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সারসংসার থেকে কাব্যউপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে। ঐতিহাসিক

সাহিত্যিকী

সচেতনতার অভাব এবং জাতিগত সংকীর্ণতার কারণে যে ক্ষেত্রে হিন্দু কবিরা মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহারে অনীহা, আবার মুসলিম কবিরা হিন্দু-ঐতিহ্যের ব্যবহারে অনীহা, সেক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম অবলীলায় উভয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমভাবে কাব্যে রূপায়িত করেছেন। নজরুল ইসলাম স্বাভাবিকভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের মনোবিকাশের ধারায় কোনোরূপ আবেদন সৃষ্টি করতে হলে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকেই রূপায়িত করতে হবে, অন্যথায় তাদের চেতনায় অনুরণন সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, পুরাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং সর্বোপরি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সম্পদসম্ভার ও ঐতিহ্যের দ্বারস্থ হয়েছেন।^{১২৩} 'নবনূর' সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬) সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে বলেছিলেন, 'বঙ্গসাহিত্যের দুইধারা হিন্দুর ধারা ও মুসলমানের ধারা—গঙ্গা-যমুনার মতো মিলিত প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশকে ধন্য করুক'।^{১২৪} নজরুল ইসলামই গঙ্গা-যমুনার মতো হিন্দু-মুসলিম পৃথক দুটি সাংস্কৃতিক ধারার যুগলপ্রবাহের একটি যুক্তবেণী নির্মাণ করেন। যেহেতু সাংস্কৃতিক বিকাশই মানুষের মহত্তম বিকাশ। এ চেতনা থেকেই নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক স্বরূপ ও সমন্বয়ের নবরূপায়ণ ঘটালেন।

নজরুলের বিদ্রোহ, সাম্যবাদ, হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক সমন্বয়—এসবের মূলে ছিলো কবির আত্মমহিমাবোধ। এ আত্মমহিমাবোধ থেকে এসব ভাব বিশেষ রস ও রূপ পেয়েছে।^{১২৫} এবং তাঁকে জনগণের কাছাকাছি এনেছে; কেননা এসব ভাবের দ্বারা আজ আমরাও অনুপ্রাণিত। কবিকণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয় সেই মিলনের বাণী—

আমি গুনিতেছি মসজিদের আজান আর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি। তাহা এক সাথে উথিত হইতেছে
উর্ধ্বে—ব্রহ্মার সিংহাসন পানে। আমি দেখিতেছি, সারা আকাশ যেন খুশি হইয়া উঠিতেছে।^{১২৬}

তথ্য সূত্র

১. আতাউর রহমান, নজরুল কাব্য-সমীক্ষা, মুক্তধারা, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ, ১৯৮৭, পৃ: ১২৫।
২. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের হারামণি (বাউল গানের সংগ্রহ) রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা।
৩. মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, ১৯৯১, পৃ: ৯০-৯১।
৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি-সংস্কৃতি-সাহিত্য, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪৮ সাল, পৃ: ২৫-২৬।
৫. Tarachand, Influence of Islam on Indian Culture, Allahabad, 1946, p. 137.

হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐক্য ও কবি নজরুল ইসলাম

৬. অমৃতলাল বাল। আলাওলের কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, ঢাকা, পৃ: ৩০৬।
৭. ফ্রবকুমার মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলামঃ কবিমানস ও কবিতা, রত্নাবলী, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩।
৮. মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী (১ম খণ্ড) মুসলিম বাংলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমী-ঢাকা, ১৯৯১, পৃ: ২৭৮।
৯. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ: ১০-১১।
১০. তদেব, পৃ: ৩০৯।
১১. মুজাফফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ: ২৮৩, ২৯৪, ২৯৯-৩০০ দ্রষ্টব্য।
১২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৩০৮।
১৩. আতাউর রহমান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ১২৪।
১৪. তদেব, পৃ: ১২৪।
১৫. তদেব, পৃ: ১২৫।
১৬. তদেব, পৃ: ১২৭।
১৭. কাজী নজরুল ইসলামঃ অভিভাষণ, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ: ১২৭।
১৮. কৃষ্ণ গোপাল রায়, কবি নজরুল ও তাঁর কবিতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ: ১০০।
১৯. আতাউর রহমান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ১২৯।
২০. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৩১৫।
২১. নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৩২-৬৩৩।
২২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ: ৩০৯।
২৩. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা,
২৪. সৈয়দ এমদাদ আলী, বঙ্গভাষা ও মুসলমান, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৫ সাল।
২৫. কাজী আবদুল ওদুদ, শাস্ত্রত বঙ্গ, 'নজরুল ইসলাম' (প্রবন্ধ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সিরিজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩ সাল, পৃ: ৯৪।
২৬. নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ: ৮৮৩।

